বাণিজ্যের এক বড় ভূমিকা থাকবেই। শিল্প-বাণিজ্যের এই ভূমিকা না থাকলে শহর বাঁচবে কীরূপে?

সামন্ততন্ত্র : এতক্ষণে গুপ্তরাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেল। এবার একটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। বিতর্কটি গুপ্তযুগে সামন্ত-ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে। কিন্তু এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হলে সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

সামন্ততন্ত্র বলতে এমন এক ব্যবস্থা বোঝায় যার শুধু আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব নয়, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক তাৎপর্যও অনেক। তাই সামন্ত-ব্যবস্থা এক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থারই নামান্তর। বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় রাজা তত্ত্বগতভাবে রাজ্যের অধীশ্বর হলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নিজের জন্য সামান্য অংশ রেখে রাজ্যের বাকি অংশ মুখ্য সামন্তদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। মুখ্য সামন্তরা স্ব স্ব এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজস্ব আদায়েও তাঁদের ক্ষমতা অপ্রতিহত। তাঁরা এই ক্ষমতা ভোগ করেন কয়েকটি শর্তে। এক শর্তে তাঁরা রাজাকে যুদ্ধের সময় সৈন্য ও রসদ দিয়ে সাহায্য করেন। আর এক শর্তে তাঁরা প্রতি বছর রাজাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেন। তাছাড়া প্রয়োজনে তাঁরা রাজাকে মন্ত্রণা ও পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করেন। মুখ্য সামন্ত তাঁর শর্ত পালন করলে রাজা তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এই একই শর্তে মুখ্য সামন্ত আবার তাঁর এলাকা অধস্তন সামন্তদের মধ্যে বিতরণ করেন। অধস্তন সামন্তরা মুখ্য সামন্তের অনুগত থাকেন, রাজার প্রতি তাঁদের আনুগত্য নেই। অধস্তন সামন্ত অনুরূপভাবে তাঁর জমি আরও ক্ষুদ্র সামন্তদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করেন। ক্ষুদ্র সামন্ত অধস্তন সামন্তের অনুগত হন, রাজা বা মুখ্য সামন্তের সঙ্গে তাঁর সংযোগ থাকে না। এভাবে একই শর্তে বিভিন্ন স্তরের ভূস্বামীদের মধ্যে রাজ্যের জমি বণ্টিত হয়। এক একজন ভূস্বামীর আনুগত্য থাকে ঠিক তাঁর উপরের স্তরের ভূস্বামীর প্রতি, আরও বড় যে ভূস্বামী তাঁর প্রতি নয়। ভূস্বামীদের সর্বনিম্ন স্তরের নীচে ভূমিদাস বা সার্ফদের অবস্থান। ভূমিদাসরা ভূস্বামীদের জমিতে আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা জমির মালিক নন। জমির মালিকানা বদল হলে জমির সঙ্গে তাঁরাও হস্তান্তরিত হন। এই ব্যবস্থায় ভূস্বামীদের মধ্যে পীড়নমূলক কর চাপানোর প্রবণতা বাড়ে। পণ্যসামগ্রী প্রধানত তাৎক্ষণিক ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হতে থাকে, যে অতিরিক্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের পথ সুগম করে তা ব্যাহত হয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন হয়। এক একটি অঞ্চল স্বনির্ভর হয়। অঞ্চলে অঞ্চলে পণ্য বিনিময়ের সুযোগ হ্রাস পাওয়ায় এক আবদ্ধ অর্থনীতি আত্মপ্রকাশ করে। মুদ্রার ব্যবহার কমে আসে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আঞ্চলিকতা তথা বিকেন্দ্রীকরণ কায়েম হয়। সমাজ-জীবনে স্থাণুত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরিবর্তন বা অভিনবত্বের পথ রুদ্ধ হয়। আঞ্চলিকতার প্রবণতা, ভূমিব্যবস্থায় অন্তর্বর্তীর উদ্ভব, স্বনির্ভর অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, মুদ্রার অত্যল্প ব্যবহার, বাণিজ্যিক অবনতি, নগরের অবক্ষয়, রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামন্ত-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট লক্ষণরূপে চিহ্নিত করা যায়।

সামন্ত-ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি লক্ষণ গুপ্তপর্বে দেখা দিয়েছিল বলে অধ্যাপক শর্মা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা নিম্নরূপ কয়েকটি লক্ষণ সনাক্ত করেছেন :

প্রথমত, এ সময় থেকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক-ভাবে জমি দান করা হতে থাকে। প্রদত্ত ভূখণ্ড বা গ্রামের উপর দানগ্রহীতাদের আধিপত্য

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরা কার্যত ভূস্বামীতে পরিণত হন। গ্রাম থেকে তাঁরা শুধু রাজস্বই আদায় করতেন না, প্রশাসনিক এবং বিচার-সংক্রান্ত কাজকর্মও পরিচালনা করতেন। এর ফলে রাজার ক্ষমতা সংকুচিত হয় এবং এক ক্ষমতাশালী বিত্তবান ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়।

দ্বিতীয়ত, ভূস্বামীরা জমিতে নিজের হাতে চাষ-আবাদ করতেন না, তাঁরা এ কাজে শ্রমিক চাষীদের নিয়োগ করতেন। জমির উপর এই চাষীদের কোনও মালিকানা ছিল না, ভূস্বামীরা তাঁদের কাছ থেকে বৃষ্টি ও নানা রকম পীড়নমূলক কর আদায় করতেন। যেসব চাষীদের জমিতে ভোগাধিকার ছিল তাঁদেরও ভূস্বামীরা খেয়ালখুশি মতো উৎখাত করে অন্য চাষীদের নিয়োগ করতেন। কৃষকদের সঙ্গে রাজা তথা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হয়। ভূস্বামীরা মধ্যস্বত্ব-ভোগীর ভূমিকায় দেখা দেন। কৃষকদের অবস্থা হল ভূমিদাসদের মতো।

তৃতীয়ত, প্রদত্ত গ্রামে বা ভূখণ্ডে যে উৎপাদন হত তা ভূস্বামী বা গ্রামবাসীদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই মেটাত। কারিগর-শিল্পীরাও গ্রামের চাহিদাই পূরণ করতেন। এই চাহিদা পূরণ করে অন্য গ্রাম বা অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার মতো উদ্‌বৃত্ত কিছু জমত না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক একটি গ্রাম স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, লেনদেন করার মতো কৃষিজ ও শিল্পোৎপাদন না হওয়ায় বাণিজ্যে সংকোচন দেখা দেয়। পূর্ববর্তী যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এ পর্বে তাতে ছেদ ঘটে।

পঞ্চমত, শিল্প-বাণিজ্য হল নগরের প্রাণ। প্রধানত শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপেই নগরের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ পর্বে শিল্পবাণিজ্যে সংকোচন হওয়ায় নগর তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক বা ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে কিছু শহর তখনও ছিল কিন্তু পণ্যসামগ্রীর লেনদেনের কেন্দ্ররূপে নগরের আর সে ভূমিকা ছিল না। নগরায়ণে অবক্ষয় নেমে আসে।

ষষ্ঠত, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায়। খ্রিস্টীয় প্রথম তিন শতকে মুদ্রা ব্যবহারের যে ব্যাপকতা ছিল এই পর্বে তা আর দেখা যায় না।

গুপ্তযুগে সামন্ত-ব্যবস্থার সপক্ষে যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে তাদের যুক্তি-গ্রাহ্যতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছে। গুপ্তপর্বে সামন্ত-ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল এ মত অনেকেই স্বীকার করেন না। তাঁদের বক্তব্য নিম্নরূপ :

ইউরোপে রাজা যেসব শর্তে সামন্তদের মধ্যে জমি বিলিব্যবস্থা করতেন গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর ভারতে দানগ্রহীতাদের উপর সেসব শর্ত আরোপিত হত না। ইউরোপে সামন্ত রাজাকে নিয়মিত উপঢৌকন, রাজস্ব ও সামরিক সাহায্য প্রদান করতেন। কিন্তু দানগ্রহীতাদের এ ধরনের শর্ত-পালনের কোনও উল্লেখ গুপ্তলেখমালায় নেই। দানগ্রহীতাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের পক্ষে রাজাকে যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ইউরোপীয় সামন্তদের তুলনায় ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের জমিজমা নিতান্তই নগণ্য ছিল।

সামন্ত-ব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যক উপাদান হল চুক্তি। রাজা ও মুখ্য সামন্ত, মুখ্য সামন্ত ও অধস্তন সামন্ত এবং ক্ষুদ্র সামন্ত ও কৃষকদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হত। প্রভুত্ব-আনুগত্যমূলক এই চুক্তির ফলেই জমির উপর ভূস্বামীর প্রবল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত এবং কৃষক উৎপীড়নের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত দাসত্ব বরণ করতেন। কিন্তু সমকালীন লেখমালায় দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের কোনও উল্লেখ নেই।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইউরোপে রাজা সামন্তদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দিতেন কিন্তু অগ্রহার ব্যবস্থায় গ্রামদান বলতে গ্রামের রাজস্বভোগের অধিকার বোঝাত। গ্রাম থেকে যে রাজস্ব এতদিন রাজার প্রাপ্য ছিল গ্রামদানের ফলে সে রাজস্বে দানগ্রহীতার ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠিত হত। গ্রামবাসীর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উপর তাঁর স্বত্ব জন্মাত না। গ্রহীতা কেবল গ্রামবাসীদের রাজাকে দেয় রাজস্ব ভোগ করতেন। আর গ্রহীতা রাজস্বভোগের অধিকারী হলেও তিনি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায় করতেন, না সরকারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন, তা নিয়ে সংশয় আছে। গ্রামের রাজস্ব গ্রহীতা ভোগ করলেও তা আদায়ের ভার ছিল সরকারের উপর, বহু দিন আগেই দীনেশচন্দ্র সরকার এ অভিমত প্রকাশ করে গেছেন।

সামন্ত-ব্যবস্থায় সামন্তরা রাজার কাছ থেকে যে জমি অধিগ্রহণ করেন তা তাঁরা অধস্তন সামন্তদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। স্বেচ্ছায় ও স্বাধিকারেই তাঁরা এ কাজ করেন। অধস্তন সামন্তরা আবার নিম্নতর সামন্তদের মধ্যে তাঁদের জমি বিলিব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, সামন্ত-ব্যবস্থায় সামন্তরা যে জমি লাভ করেন সে জমি তাঁরা আপন ইচ্ছামতো যে কোনও ব্যক্তির অনুকূলে বণ্টন বা হস্তান্তর করতে পারেন। এ কাজে তাঁদের রাজা বা উর্ধ্বতন সামন্তদের মতামতের উপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু গুপ্তযুগে প্রদত্ত জমির উপর গ্রহীতার এত অবাধ অধিকার ছিল না। গ্রহীতা নীবীধর্মের শর্তে জমি ভোগ করতেন। তাঁর জমির উপর ভোগাধিকার ছিল কিন্তু সে জমি দান, বিক্রয় বা হস্তান্তরের অধিকার তাঁর ছিল না। ইউরোপীয় সামন্তদের তুলনায় গুপ্তভারতে গ্রহীতাদের অধিকার যে অনেকখানি সংকুচিত ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

সামন্ত-ব্যবস্থায় জমিবণ্টনের ফলে রাজার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার সংকুচিত হয়, সার্বভৌমত্ব খণ্ডিত হয়। কিন্তু অগ্রহার ব্যবস্থায় তেমনটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ভূমিদানের ফলে রাজার প্রাপ্য রাজস্ব রহিত হত, এ কথা ঠিক কিন্তু মনে রাখতে হবে যে জমি সাধারণত দান করা হত তা ছিল অনাবাদি, পতিত জমি। সে জমি থেকে কোনও রাজস্ব পাওয়া যেত না। তাছাড়া যে জমি দান করা হত সে জমির মূল্যবাবদ রাজকোষে থোক টাকা জমা পড়ত। এতে রাজাই লাভবান হতেন। আরও একটি জিনিস মনে রাখা দরকার। যে জমি দান করা হত তা রাজ্যের বিশালত্বের তুলনায় পরিমাণে অনেক কম ছিল। গুপ্ত রাজারা তাঁদের সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি অগ্রহারে বিভক্ত করেছিলেন, এমন ধারণা করার কোনও কারণ নেই। গ্রহীতা রাজস্ব ভোগের অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই রাজস্ব আদায়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্বও তাঁর হাতে ছিল এমন মনে করারও কোনও যুক্তিসংগত কারণ নেই। প্রদত্ত ভূখণ্ডে গ্রহীতা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, রাজার শাসন সেখানে কায়েম ছিল না, এ ধারণারও কোনও ভিত্তি নেই।

ইউরোপীয় সামন্ত-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ভূমিদাসদের অবস্থান। ভূমিদাসরা তাঁদের জমিতে আবদ্ধ ছিলেন। জমির উপর তাঁদের কোনও স্বত্ব ছিল না। জমির মালিকানার পরিবর্তন ঘটলে জমির সঙ্গে তাঁরাও হস্তান্তরিত হতেন। ভারতবর্ষে কিন্তু এমনটি ঘটেনি। এ দেশের গ্রামে যেসব পেশাদার পুরোহিত, ক্ষৌরকার, সূত্রধর ও রজকদের বাস ছিল তাঁরা সকলেই ভূসম্পদ লাভ করতেন এবং প্রতিদানে বিনা পারিশ্রমিকে গ্রামবাসীদের সেবা করতেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় যে কোনও সময় গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারতেন। তাঁরা ভূমিদাস ছিলেন না। যেসব কৃষক সরকারি জমিতে কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো অবস্থার বিপাকে ভূমিদাসে পরিণত হতেন, কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য ছিলেন। বেশির ভাগ কৃষকই কিছু জমি ও উৎপন্ন ফসলের একাংশের বিনিময়ে সরকারি জমিতে চাষ-আবাদের কাজ করতেন। সরকারি সুযোগসুবিধা প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা যে কোনও সময় অন্য স্থানে নতুন কর্মভার গ্রহণ করতে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পারতেন। ইউরোপের ভূমিদাস আজীবন ভূমিদাসই ছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষে যে সামান্যসংখ্যক দাস ছিলেন তাঁদের মুক্তির পথ সব সময়ই উন্মুক্ত ছিল।

গুপ্তপর্বে যে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলা হয় সমকালীন সূত্রে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। অর্থনীতির দু'টি প্রধান ক্ষেত্র— একটি কৃষির ক্ষেত্র, অন্যটি শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র। এ পর্বে কৃষির যে বিকাশ ঘটেছিল তা স্বীকার না করে উপায় নেই। অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে যে জমি দান করা হত তার বেশির ভাগই ছিল অনাবাদি ও অরণ্যসংকুল। সেসব অঞ্চলে না ছিল জনবসতি, না ছিল কৃষিকার্য। সে জমি দান করার ফলে শুধু দানগ্রহীতাই সেখানে বসতি স্থাপন করলেন না, চাষ-আবাদ ও অন্যান্য কাজের জন্য কৃষক ও বিভিন্ন বৃত্তির লোকদেরও সেখানে বসতি গড়ে ওঠে। এর ফলে কেবল জনবসতিরই প্রসার ঘটল না; অনাবাদি-জঙ্গুলে জমিতে শস্যাদি উৎপন্ন হতে থাকল। এতে স্বাভাবিকভাবে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কৃষির মতো শিল্পেও এই পর্বে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই বৈচিত্র্য বেশি করে চোখে পড়ে ধাতব শিল্পে। লোহা ও তামার জিনিস-পত্র এ সময় বেশি পরিমাণে নির্মিত হতে থাকে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের তৈরি দিল্লির মেহরৌলী লৌহস্তম্ভ তখনকার দিনের ধাতুশিল্পের উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহন করছে। কুম্ভকার, সূত্রধর, রথকার, কাংসকার, রেশমশিল্পী, তন্তুবায়, অস্ত্রনির্মাতা, চর্মকার, কর্মকার, শুঁড়ি ইত্যাদি শিল্পী-কারিগর ও তাঁদের শ্রেণী বা পেশাদারি সংগঠনের উল্লেখ সেকালের সাহিত্য ও লেখমালায় বিস্তর পাওয়া যাবে।

আন্তর ও বহির্বাণিজ্যে এ সময় মন্দা দেখা দিয়েছিল, এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই। কালিদাসের কাব্যে ও অমরকোষে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আছে। লেখমালায় সার্থবাহ, শ্রেষ্ঠী ও বণিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। শক মুদ্রার এক ভাণ্ডার অন্ধ্রপ্রদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের সাতারায় গুপ্তমুদ্রার এক ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলি অন্ধ্রপ্রদেশে বা মহারাষ্ট্রে উৎকীর্ণ হয়নি, উৎকীর্ণ হয়েছিল গুজরাত এবং গাঙ্গেয় ভূভাগে। বাণিজ্য উপলক্ষেই মুদ্রাগুলির স্থানান্তর ঘটেছিল। রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের গতি এ সময় স্তিমিত হলেও বাইজানটাইন সাম্রাজ্য তথা পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। চিনের সঙ্গে ভারতের স্থল ও জল উভয় পথেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গেও ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলার তাম্রলিপ্তি, ওড়িশা উপকূলের চে-লি-ত-লো (পুরী?) এবং অন্ধ্রপ্রদেশের দন্তপুর আন্তর্জাতিক বন্দররূপে খ্যাতিলাভ করে।

গুপ্তযুগে মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছিল বলে যে মন্তব্য করা হয় তা সমর্থনযোগ্য নয়। গুপ্তরাজেরা প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সেসব মুদ্রার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সাহিত্য ও লেখমালায় দীনার, পুরাণ, রূপক, নিষ্ক, সুবর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে সোনা ও রূপার মুদ্রার সংখ্যাই বেশি। দূরপাল্লার বাণিজ্যে বা মূল্যবান জিনিসপত্রের কেনাবেচার ক্ষেত্রে সোনা ও রূপার মুদ্রার প্রয়োজন হয় কিন্তু গ্রামগঞ্জের হাটে-বাজারে দৈনন্দিন কেনাবেচায় তামার মুদ্রাই ব্যবহার হয়। গুপ্ত আমলেও তামার মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল তবে তা পরিমাণে অল্প ছিল। তার অর্থ এই নয় যে তখন দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ হ্রাস পেয়েছিল। এসব কাজে তখন কড়ি ব্যবহার হত। অন্তত চিনা পরিব্রাজক ফা শিয়েনের সাক্ষ্য থেকে তাই মনে হয়। অর্থাৎ তাম্রমুদ্রার ঘাটতি কড়ি দিয়ে পূরণ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

করা হত। তাছাড়া খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে কার্ষাপণ নামে এক শ্রেণির তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ করেছেন খ্যাতনামা বৌদ্ধ দার্শনিক বুদ্ধঘোষ। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার এক বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। রাজনৈতিক পালাবদল সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে পুরানো মুদ্রার প্রচলন অব্যাহত থাকত। অর্থাৎ গুপ্তপর্বে শুধু গুপ্তরাজগণের মুদ্রাই প্রচলিত ছিল না, পূর্ববর্তী মুদ্রারও প্রচলন ছিল। বর্ধমানের নিকট মঙ্গলকোটে উৎখননের ফলে গুপ্তসংস্তর থেকে কুষাণযুগের প্রচুর তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে কুষাণমুদ্রার অব্যাহত প্রচলনের সপক্ষে এটি একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ।

দেখা যাচ্ছে, গুপ্তযুগে সামন্ত-ব্যবস্থার সপক্ষে যেসব যুক্তি-তর্ক দেওয়া হয় তা যথেষ্ট দুর্বল। অগ্রহার-ব্যবস্থা গুপ্তভারতে সামন্ততন্ত্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছিল, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সামগ্রিকভাবে গুপ্তপর্বে অর্থনৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, এমন ধারণারও কোনও যুক্তি নেই। আন্তর ও বহির্বাণিজ্যে এ সময় সন্তোষজনক অগ্রগতি ঘটেছিল। দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস-পত্রের কেনা-বেচার কাজে তামার মুদ্রা, কড়ি ও পুরানো কার্ষাপণ মুদ্রার প্রচলন ছিল। কয়েকটি পুরানো শহরের পতন আসন্ন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বেশ কিছু নতুন শহরও গড়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগের অন্তিমপর্বে যে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তার মূলে ছিল প্রশাসনিক দুর্বলতা, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনয়ন। সামন্ত-ব্যবস্থা বা অনুরূপ কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে এই আর্থিক অবনতির কোনও যোগসূত্র ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জি

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : *ভারতীয় জাতি-বর্ণ প্রথা* (কোলকাতা, ১৯৮৭)।

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় : *ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা* (কোলকাতা, ১৯৯৪)।

সর্বীর চক্রবর্তী : *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে* (কোলকাতা, ১৩৯৮)।

Altekar, A. S : *The Coinage Of The Gupta Empire* (Vanarasi, 1957) ; *The Vākāṭaka-Gupta Age* (Lahore, 1946).

Bhandarkar, D. R. : *Corpus Inscriptionum Indicanum*, Vol. III (New Delhi, 1981).

Ghosal, U. N. : *The Agrarian System In Ancient India* (Calcutta, 1973).

Jha, D. N. : *Revenue System In the Post-Maurya And Gupta Times* (Calcutta, 1967).

Maity, S. K. : *Economic Life In Northern India In The Gupta Period* (Delhi, 1970).

Majumdar, R. C. (Ed.). : *The Classical Age* (Bombay, 1962).

Saletore, R. N. : *Life In The Gupta Age* (Bombay, 1943).

Sharma, R. S. : *Sudras In Ancient India* (Delhi, 1958) ; Indian Feudalism (Delhi, 1980).

Thapar, Romila : *Ancient Indian Social History* (Delhi, 1978).

Upadhyaya, B. : *Gupta sāmrājya kā itihāsa*, I-II (Allahabad, 1939).

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner